দৈনিক ইনকিলাব

সুশিক্ষা চরিত্র গঠনের প্রধান অবলম্বন

নিপু রহিম

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষক সমাজের মেরুদণ্ড, ছাত্ররা দেশের ভবিষ্যৎ। এ পংক্তিগুলো পৃথিবীর প্রত্যেক সাক্ষরজ্ঞান থাকা ব্যক্তিমাত্রেরই জানা। কিন্তু থাকলে কী হবে? আজকের দিনে একজন শিক্ষক তাঁর দায়িত্ব কতটুকু পালন করেন। আর ছাত্ররাইবা কতটুকু দায়িত্ব নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকরা কী কর্তব্য পালন করছেন তা-ও দেখতে হবে।

বাংলাদেশ যেহেতু গ্রামকেন্দ্রিক আর গ্রামে বসবাস করেন বেশিরভাগ নাগরিক, তাই গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার ছবিটা দেখে নেওয়া প্রয়োজন। অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, গত কয়েক দিনে প্রায় ২৫টি স্কুলের খবর নিয়ে যা অবগত হয়েছি তাতে অবাক না হয়ে উপায় নেই। বড় একটা অংশের স্কুলগুলো কোনও না কোনভাবে সমস্যায় জর্জরিত। কোথাও স্কুল আছে পড়ালেখার পরিবেশ নেই। কোথাও স্কুল আছে, কিন্তু সেখানে গরু-ছাগলের আস্তানা। আবার কোথাও স্কুল থাকলেও শিক্ষকের অভাব। তা হলে লাভটা কী হচ্ছে? সরকার এত টাকা ব্যয় করে সত্যিই কি সবাইকে শিক্ষা প্রদান করতে পারছে?

শুধু নাম লেখা জানা ব্যক্তিদের গণনায় এনে যদি আমরা শিক্ষিতের হার বিবেচনা করি, তবে কি আমাদের হিসেবে এগিয়ে যাবেন। কখনও না। কোনও একদিন ছিল যখন শিক্ষাকে ব্যবসা থেকে দূরে রাখা হতো। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষা এ দেশের সব থেকে বড় ব্যবসা। সরকার সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমনভাবে লুপ্ত করেছে এবং এই সংস্থাগুলোর সঙ্গে এমন আচরণ করছে যে সচেতন অভিভাবক কখনও সন্তানকে সরকারি মাধ্যম স্কুলে ভর্তি করতে চাইবে না। আর বেসরকারি মানে অঢেল টাকার খেলা।

বিত্তশালীরা অঢেল টাকা ব্যয় করে সন্তানকে নামি-দামি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পড়ার জন্য পাঠাচ্ছেন, যদিও তাদের সংখ্যা খুব কম। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের এখানেই। এই কম সংখ্যকই আমাদের দেশটাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। গ্রামের কৃষকের যত মেধাবী ছেলেই হোক, সে যদি ডাক্তার হওয়ার কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে তার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠে না। মধ্য ও উচ্চ শিক্ষিতরা বলেন, সরকার ঋণের ব্যবস্থা করেছে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের জন্য। কিন্তু তাতো বাস্তবে পরিলক্ষীত হচ্ছে না। আজ যখন কেউ

ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে যায় তখন তাকে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। বাধ্য হয়ে তাকে দালাল ধরতে হয়। দালালরা নিয়ে নেয় অর্ধেক টাকা। স্বচক্ষে না দেখে বর্তমান যুগে কেউ একথা বিশ্বাস করতে চায় না। বাস্তবকে কখনও ঢেকে রাখা যায় না বলে প্রবাদ আছে। যদিও আজ এ প্রবাদের মান অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। বর্তমান অভিজাতরা বাস্তবকে ঢেকে রাখার কৌশল খুব ভালোভাবেই রপ্ত করে নিয়েছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্ররা আজ শিক্ষার বদলে দুর্নীতি বেশি শিখছে। বাড়িতেও তাই। বেশিরভাগ অভিভাবক আকাল আর সন্তানদের পরোপকারী হওয়ার কোনও উপদেশ দেন না, দেন শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাধারা ও আদর্শে গড়ে তোলার। ফলস্বরূপ তারা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে, যৌথ পরিবার ভাঙছে, মা-বাবাকে বৃদ্ধাবাসে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। মূল্যবোধহীন শিক্ষা জন্ম দিচ্ছে দুর্নীতির। আর এতে সমাজের প্রতিটি স্তরে এত গভীরভাবে দুর্নীতির শেকড় প্রোথিত হচ্ছে যে আমরা আজ যে কোনও কাজকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখি। দুর্নীতিহীনতা দেখলে অবাক হই। এসব চিন্তাধারার জন্য দেওয়ার জন্য আমরা কাকে দায়ী করতে পারি? আমাদের আজ এই অবক্ষয় থেকে কে মুক্তি দিতে পারে? অবশ্যই শিক্ষা। তবে যান্ত্রিক ও ব্যবসায়িক শিক্ষা নয়, সঠিক মূল্যবোধের শিক্ষা। আর মূল্যবোধ সৃষ্টির শিক্ষা হচ্ছে ধর্মীয় শিক্ষা। সে শিক্ষাতো সেভাবে দেওয়া হচ্ছে না আর এর জন্য মূল্যবোধও সৃষ্টি হচ্ছে না ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। একদিন ছিল যখন ছাত্ররা স্কুল থেকে এসে কোনও লেখকের বই নিয়ে পড়তে বসত অবসর বিনোদনের জন্য, নতুবা সহপাঠীদের সঙ্গে খেলতে যেত। আজ এসব হারিয়ে গেছে। অনূর্ধ্ব পনেরো বছরের বালক-বালিকার হাতে পৌঁছে গেছে মুঠোফোন। সময় কাটানোর জন্য মোবাইল ফোনে গান শোনা, ফেসবুকে দীর্ঘক্ষণ বসে আড্ডা মারতেই ভালোবাসে তারা।

ভাবতেও অবাক লাগে আমরা সামাজিকতাকে পেছনে ঠেলে দিয়ে এক নতুন দিশায় হাঁটছি। এখানে কি আমরা একা হয়ে যাচ্ছি না? হ্যাঁ, আমরা এককেন্দ্রিক হয়ে পড়ছি। আমরা আজ সম্পূর্ণ একা। আমাদের সামাজিকতায় এখন আর নৈতিকতার প্রশ্রয় নেই। ভোগ্যপণ্যের প্রতি দিন দিন লালসা বাড়ছে। নৈতিকতাকে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হচ্ছে গ্রামের দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা। ছেলেরা স্কুল ছেড়ে হাজার মাইল দূরে পাড়ি দিচ্ছে বেঁচে থাকার তাগিদে। প্রয়োজনীয় শিক্ষা না থাকায় ওখানে তারা সল্প বেতনে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। পরিশ্রম অধিক, তাই কাজের পর অবসর বিনোদনস্বরূপ নেশা করে। তাই অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায়, পুরো বছর কাজ করে যে টাকা উপার্জন করে তাতে বাড়ি আসার ভাড়াও জোগাড় হচ্ছে না। সৃষ্টি হচ্ছে 'জেনারেশন গ্যাপ'-এর।

গ্রামের নতুন প্রজন্ম শুধু সরকারি মাধ্যমের স্কুলে সপ্তম, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে চলে যাচ্ছে বিদেশে। সরকারি পরিসংখ্যানে তারা শিক্ষিত, কিন্তু প্রকৃতরূপে তারা কতটুকু শিক্ষিত তা বিচারের ভার পাঠকদের উপর ছেড়ে দিলাম। আগেই বলেছি, আমাদের দেশে সাক্ষরতার হার দিন দিন বাড়ছে, কিন্তু শিক্ষিতের হার বাড়ছে না। এর জন্য অবশ্যই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন জরুরি। শুধু শুধু সাক্ষর বানানোর জন্য গ্রামের দরিদ্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলেখেলা অনুচিত। দুর্নীতি দূর করতে হবে শিক্ষা বিভাগ থেকে। উপযুক্ত শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষাদানের পাশাপাশি ছাত্রানুপাতে শিক্ষক নিয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একশ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য একজন শিক্ষক হলে শিক্ষাদান সাক্ষরতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেনি। শুধু সাক্ষরতার হার বাড়ানোর দিকে নজর দিলে কল্যাণের বদলে অকল্যাণই হবে। তাই সাক্ষরতার পাশাপাশি প্রকৃত শিক্ষিতের হার বাড়ানোর উপর নজর দেওয়াই হবে প্রথম এবং প্রধান কাজ।